৪. তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যা এবং ফলিত নীতিবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক

তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার (theoretical ethics) সঙ্গে ফলিত নীতিবিদ্যার (applied ethics) দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে নানা কারণে। একটি কারণ সম্ভবত এই যে, নীতিদর্শনের ইতিহাসে

তত্ত্ব (theory) আর প্রয়োগ (application) কোনোদিন পরস্পরসাপেক্ষ বলে স্বীকৃত হয়নি। তাই তত্ত্ব উদ্ভাবনের প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োগের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তত্ত্বের শাসন বিশেষ মর্যাদা পায়নি। অর্থাৎ, তত্ত্বকে উপেক্ষা করেই বাস্তব পরিস্থিতিতে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সাঙ্গ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কিন্তু এরকম দুর্বিপাক ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনীতিতে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ হাত ধরাধরি করে চলেছে। মাইক্রো-ইকনমিকসের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যবিচারের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভিন্ন ভিন্ন বিচারধারার মধ্যে একটা পদ্ধতিগত ঐক্য রয়ে গেছে। অর্থাৎ, কোনো না কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের চিহ্ন থেকে গেছে। তা ছাড়া, কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্বকে রক্ষা করতে হলে অর্থনীতিবিদেরা সব সময়েই বাস্তব তথ্যাদি সংগ্রহে মন দিয়েছেন। ফলে, অর্থনীতিতে তত্ত্ব কখনও প্রয়োগ থেকে বিচ্যুত হয়নি, প্রয়োগও কখনও তত্ত্বকে বাদ দিয়ে হয়নি। কিন্তু নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটেছে। কেননা, কোন্ নীতিগুলোকে (principles) মৌলিক বলে ধরা হবে, কী ধরনের বাস্তব তথ্য (data) নৈতিক বিচারের বেলায় প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে, নীতিতত্ত্ব গঠনের পদ্ধতিটি কী হবে, একটা নীতিতত্ত্বকে বাস্তবে কীভাবে যাচাই করে নেওয়া যাবে—এসব প্রশ্নে নীতিদার্শনিকেরা চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন অভিমতের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। এমন কি, নীতিতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি থাকা বলতে কী বোঝায়, এইরকম গোড়ার প্রশ্নেও তাঁদের মধ্যে মতভেদ থেকে গেছে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই নীতিদর্শনে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ একে অপর থেকে ক্রমাগত দূরে সরে গিয়েছে। এবং সেই সূত্রেই সৃষ্টি হয়েছে তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার সঙ্গে ফলিত নীতিবিদ্যার দূরত্ব।

অদূর ভবিষ্যতে এ দূরত্ব কমে আসবে বলে মনে হয় না। প্রথমত, কবে কোনকালে প্রয়োগমুখী নীতিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে, সেই সুদিনের জন্যে ফলিত নীতিবিদ্যা অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সত্যিকারের প্রয়োগমুখী নীতিতত্ত্ব যাতে বিকশিত হতে পারে সেইজন্যেও ফলিত নীতিবিদ্যার স্বতন্ত্র চর্চা অব্যাহত থাকা দরকার। কারণ, ফলিত নীতিবিদ্যা যত বেশি করে বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানে মন দেবে ততই নতুন নতুন সমাধানসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং সেইসব সমাধানসূত্রের ওপর আস্থা রেখে দার্শনিকেরা আদর্শ প্রয়োগকুশল নীতিতত্ত্ব তৈরি করতে পারবেন।

বস্তুত, তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার সার্থক বিকাশের স্বার্থেই ফলিত নীতিবিদ্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। সমকালের এক অগ্রগণ্য নীতিদার্শনিক জন রল্‌স কিছুদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন যে, তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যা এখনও তার শৈশবে রয়ে গেছে। কথাটা ঠিক। যে নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা বাস্তবের কঠিন কঠিন সমস্যাগুলোর সামনে দিশাহারা হয়ে পড়ে, পথ দেখাতে পারে না, সেই নীতিবিদ্যাকে শিশু বলা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে

পারে? কিন্তু মনে রাখা দরকার, শিশুরও ভবিষ্যৎ থাকে। তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে এ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ফলিত নীতিবিদ্যার সার্থক বিকাশের ওপর। কারণ, এমন দিনের কথা সত্যিই ভাবা যায়, যখন ফলিত নীতিবিদ্যায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে নতুন ধরনের নীতিতত্ত্ব আর সেইসব তাত্ত্বিক সূত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে ফলিত নীতিবিদ্যা এগিয়ে যাবে নতুন নতুন বিতর্কের সমাধানে।

বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় নীতিতত্ত্বের আকারপ্রকার এখনকার তুলনায় অনেক জটিল হবে। কেননা, একটি-দু'টি সাধারণ নীতিসূত্র (moral principles) তৈরি করা এরকম নীতিতত্ত্বের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। নির্দিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতিতে এসব নীতিসূত্র প্রয়োগ করতে গেলে কী কী নিয়মবিধি (rules) পালন করা দরকার তার একটা তালিকাও এ নীতিতত্ত্বকে প্রণয়ন করতে হবে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতের তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যাকে সব সময় মনে রাখতে হবে, সমাজবদ্ধ মানুষ কতকগুলো প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করে। তার প্রায় প্রতিটি কর্তব্য-নির্বাচনের মূলে এসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবদান থাকে। সুতরাং আগামীদিনের নীতিতত্ত্ব-কাঠামোর মধ্যে সাধারণ নীতিসূত্র (general moral principles) ছাড়াও *অবস্থাভিত্তিক কর্তব্যপালনের বিধিগুলোকে* স্থান করে দিতে হবে। ফলে, এইরকম নীতিতত্ত্বের চোখে নৈতিক বিচারের সার্বিক মানদণ্ড (universal criterion) বলে হয়ত কিছু থাকবে না। পরিবর্তে নানা স্তরের (levels) এবং নানা পর্বের (phases) নৈতিকতা আমাদের বিচার্য হবে। তবে, এ সবই নির্ভর করছে ফলিত নীতিবিদ্যার যথাযোগ্য বিকাশের ওপর। ব্যবহারিক জীবনের নানা নৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ফলিত নীতিবিদ্যা কী পরিমাণ সাহায্য করতে পারে তার ওপর।

আসলে, তত্ত্ব এবং প্রয়োগের মধ্যে কোন্‌টি স্বয়ম্ভর, সেই প্রশ্নটাই অবান্তর। বহুদিন আগে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন মাও-সে-তুঙ। ওঁর ভাষায় ঃ

> অনুশীলন থেকে জ্ঞানের শুরু হয়, এবং অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে আবার অবশ্যই অনুশীলনে ফিরে আসতে হয়। .....অনুশীলন, জ্ঞান, আবার অনুশীলন এবং আবার জ্ঞান, এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে অন্তহীন চক্রাবর্তে, এবং প্রতিটি চক্রাবর্তের সাথে সাথে অনুশীলন ও জ্ঞানের অন্তর্বস্তুটি উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়।
>
> (মাও-সে-তুঙ ঃ 'অনুশীলন সম্পর্কে')

তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যা এবং ফলিত নীতিবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এই অনুশীলন-তত্ত্বজ্ঞান-অনুশীলনের চক্রাবর্তটি স্মরণে থাকা দরকার। কারণ, তাহলে বোঝা যাবে যে, ফলিত নীতিবিদ্যা প্রকৃত অর্থে তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার বিরোধী নয়। বিকল্পও নয়। বরং একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। ফলিত নীতিবিদ্যার অনুশীলনী দৃষ্টিতে (practical view) বাস্তবের যে দিকটা ধরা পড়ে তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে

পারে সার্থক নীতিতত্ত্ব। আর, এইরকম অনুশীলন-লব্ধ নীতিতত্ত্ব থেকেই ফলিত নীতিবিদ্যা যোগাড় করতে পারে নৈতিক মূল্যায়নের পদ্ধতিপ্রকরণ।

৫. ফলিত নীতিবিদ্যার উপবিভাগ

ফলিত নীতিবিদ্যার যেকোনো বই-এর পাতা ওলটালে দেখা যাবে, এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রায় অন্তহীন। নরহত্যা, আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা থেকে শুরু করে যুদ্ধবিগ্রহ, জনস্ফীতি, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, যৌনাচার—এক কথায় জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি বিকারের দিকে ফলিত নীতিবিদ্যার নজর। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবন, দুই-ই এর পর্যালোচনার মধ্যে পড়ে। এত বিশাল মাপের একটা বিদ্যা হওয়া সত্ত্বেও ফলিত নীতিবিদ্যার কয়েকটি উপবিভাগের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে ফলিত নীতিবিদ্যার সেইসব শাখার কথা বলা যায় যেগুলি ইদানীং নীতিদর্শনের আলোচনায় অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করেছে। এসব শাখা-শাস্ত্রের মধ্যে আছে ঃ চিকিৎসাশাস্ত্রীয় নীতিবিদ্যা (medical ethics), পরিবেশ সম্পর্কিত নীতিবিদ্যা (environmental ethics), ব্যবসাক্ষেত্রের নীতিবিদ্যা (business ethics), প্রযুক্তিক্ষেত্রের নীতিবিদ্যা (technological ethics) এবং পেশাঘটিত নীতিবিদ্যা (professional ethics)। এ ছাড়া, নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ পুরনো নীতিতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার মধ্যে পুরুষপ্রাধান্যের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। নীতিবিদ্যার চর্চার মধ্যে এঁরা একধরনের নারীবাদী (feminist) মাত্রা আনার পক্ষপাতী। এঁদের কথাবার্তাও ইদানীং ফলিত নীতিবিদ্যার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ফলিত নীতিবিদ্যার এসব উপবিভাগে আজকাল কী ধরনের বিতর্ক উঠে আসছে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল। প্রথম দৃষ্টান্তটি *পরিবেশ-নীতিবিদ্যা* থেকে।

একবিংশ শতাব্দীর একটি ভয়ংকর পরিবেশসমস্যার নাম *গ্রীনহাউস এফেক্ট*। 'গ্রীনহাউস' কথাটা উদ্ভিদবিদ্যার কাছ থেকে ধার করা। শীতের দেশে চারাগাছের পরিচর্যার জন্যে একধরনের কাঁচের ঘর ব্যবহার করা হয়। এরকম কাঁচের ঘরে সূর্যের যতটা তাপ প্রবেশ করে তার অনেকটাই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে, গ্রীনহাউসের ভেতরটা বাইরের তুলনায় গরম থাকে এবং চারাগাছগুলো সেই স্বাভাবিক উত্তাপে বেড়ে উঠতে পারে।

কিছুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, সমগ্র পৃথিবী একটি গ্রীনহাউসে পরিণত হতে চলেছে। তার কারণ ঃ গত একশো বছর ধরে আমরা যত কয়লা জ্বালিয়েছি, যত তেল পুড়িয়েছি, তাতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, আরও নানারকম গ্যাসের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে এবং এর ফলে বায়ুমণ্ডলটিই কাঁচঘরের দেওয়ালের মত কাজ করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ সূর্যের যতটা তাপ পৃথিবীতে আসছে

তার অনেকটাই আর বাইরে বেরিয়ে যেতে পারছে না। পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন, এভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে একদিকে যেমন সু-সুদীর্ঘ গ্রীষ্মকালের সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে তেমনি মেরুর বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলতল উঁচু হতে থাকবে। একদিকে আদিগন্ত খরা, অন্যদিকে আদিগন্ত প্লাবন, এই হবে আমাদের সবুজ গ্রহের ভবিষ্যৎ। বিজ্ঞানীরা মোটামুটি একমত যে, এই একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ যখন ভূপৃষ্ঠের গড়পড়তা তাপ ১.৫° সেন্টিগ্রেড থেকে ৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে তখন থেকেই শুরু হয়ে যাবে এই ধ্বংসলীলা।

প্রশ্ন হল ঃ এই ভয়াবহ পরিণামের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী?

ফলিত নীতিবিদ্যার যে শাখাটি *পরিবেশ-নীতিবিদ্যা* (environmental ethics) নামে পরিচিত, তাতে গ্রীনহাউস এফেক্টের সমস্যা সম্পর্কে বহু বিচারবিবেচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এসব আলোচনার সূত্রে আমরা গ্রীনহাউস সমস্যার গভীরতা নতুন করে উপলব্ধি করছি। এ সমস্যার সমাধানকল্পে পরিবেশ-নীতিবিদ্যা কিছু কিছু প্রস্তাবও পেশ করেছে।

পরিবেশ-নীতিবিদ্যার বিতর্কবিচারসূত্রে এই কথাটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, গ্রীনহাউস সমস্যা সমাধানের ভার সরকারী বা বেসরকারী কোনো ব্যবস্থাপক (managerial) সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। কারণ, ব্যবস্থাপক সংস্থাগুলো যেরকম লাভ-খরচের হিসেব কষে চলে তাতে এসব সংস্থার কাছ থেকে গ্রীনহাউস প্রশ্নে সুবিচার পাওয়া একরকম অসম্ভব। বস্তুত, গ্রীনহাউস এফেক্টের তীব্রতা কমিয়ে আনতে গেলে কলকারখানা চালানোর পদ্ধতিতে, মানুষের নিত্যদিনের জীবনযাপন প্রণালীতে এবং আরও নানা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এতসব আমূল সংস্কার করতে হবে এবং তার আর্থিক দায়ভার এত প্রবল হবে যে, এ-জাতীয় সংস্থাগুলোর পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করার প্রশ্নই ওঠে না। উদাহরণস্বরূপ, পেট্রোলিয়াম সহ অন্যান্য খনিজ তেল পোড়ানোর ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। এর ফলে, পৃথিবীর পরিবহন ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর দরকার হবে, এখনকার মোটরশিল্পের জায়গায় বিকল্প শিল্পায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এসবের জন্যে যে বিপুল ব্যয়ভার বহনের প্রয়োজন হবে তা সামলানোর তাগিদ এবং ক্ষমতা কোনোটাই এখনকার ব্যবস্থাপক সংস্থাগুলোর নেই। বস্তুত এই কারণেই উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে ইদানীং সরকারী বিবৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে যে, গ্রীনহাউস এফেক্টের ভয়াবহতা যতটা মারাত্মক ভাবা গিয়েছিল ততটা আদৌ নয়। মার্কিন মুলুকে যাঁরা সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তাঁদের কেউ কেউ এমন আশ্বাসবাণীও শোনাচ্ছেন যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি বিশেষ কোনো বিপদের সূচনা করছে না। তাঁদের মতে, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন নামে একধরনের বিষাক্ত

পদার্থের নির্গমন বন্ধ করতে পারলেই গ্রীনহাউস এফেক্টের বিপদ অনেকটা কেটে যাবে। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক চরিত্র এই গ্রীনহাউস এফেক্ট এড়ানোর প্রকৃত দায়িত্বভার ঘাড়ে নিতে চাইছে না। বরং বিপদের দিকটা খাটো করে দেখিয়ে প্রচলিত শিল্পব্যবস্থা এবং অভ্যাসরীতিকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে।

এসব কারণে একদল পরিবেশ-নীতিবিদ মনে করছেন যে, ম্যানেজমেন্ট-বিদ্যার কৃৎকৌশল গ্রীনহাউস সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোনো পথ দেখাতে পারবে না। তাঁদের মতে, এ সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক মাত্রা থাকলেও এটি মূলত নৈতিক (ethical) সমস্যা—মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তনের সমস্যা। যে জাতীয় মূল্যবোধের পরিমণ্ডলে আমরা গত একশো-দু'শো বছর বসবাস করছি তার সৃষ্টি হয়েছিল ধনতন্ত্র বিকাশের যুগে, বিজ্ঞানচেতনা অভ্যুদয়ের সূত্রে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, তখন সমাজে এখনকার মত জনস্ফীতি ঘটেনি, প্রযুক্তির ব্যবহারও ছিল সীমিত। এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষের দায়িত্ববোধও (sense of responsibility) সুনির্দিষ্ট দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ ছিল। তার দায়িত্ব যে শুধু সমকালীন পারিপার্শ্বিককে ঘিরে নয়, পৃথিবীর অন্য প্রান্তের অন্য কালের মানুষের জন্যেও যে তার কিছু কিছু দায়িত্ব আছে, এই বোধটাই তখন তার হয়নি। সে ধরে নিয়েছিল, ক্ষতি মাত্রেই ব্যষ্টিগত (individual) ক্ষতি, ক্ষতির কারণগুলোও সেইরকম ব্যষ্টিগত। সমষ্টিগত ক্ষতির ধারণাটাই তখন জন্মায়নি। এই সূত্রে তার আরও বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ক্ষতি এবং ক্ষতির কারণগুলো মানুষের পারিপার্শ্বিক দেশ-কালের মধ্যেই বিরাজ করে। ফলে, একটা ক্ষতির কারণ খুঁজতে সারা বিশ্বের তাবৎ লোকব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে, এমন কল্পনা তার মাথাতেই আসে নি। অমুকের ক্ষতির জন্যে অমুক দায়ী, এই সহজসরল বিচার দিয়ে সেকালের দায়দায়িত্ব নিরূপণ করা হত। সমষ্টির ক্ষতির জন্যে সমষ্টি দায়ী হতে পারে, এ সম্ভাবনা তখনকার মূল্যবোধকে তথা দায়িত্ববোধকে স্পর্শ করেনি।

এ যুগের পরিবেশ-নীতিবিদদের অনেকে আক্ষেপ করছেন এই বলে যে, গত দু'শো বছরে মানবসভ্যতার চূড়ান্ত ঐহিক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনও পুরনো দায়িত্ববোধের আদর্শটি অনুসরণ করে যাচ্ছি। তাঁদের মতে, গ্রীনহাউস সমস্যা দেখিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বের বর্তমান পরিবেশে ওই আদর্শটি অচল। উদাহরণস্বরূপ, গ্রীনহাউস এফেক্টের পরিণতি হিসেবে দক্ষিণ গোলার্ধের ঘূর্ণিঝড়-রেখা আরও দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার কথা। তাই যদি হয় তাহলে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি এলাকা ক্রমশ বেশি করে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়বে। অসংখ্য প্রাণহানি এবং ভয়াবহ ধ্বংস অনিবার্য হবে। কিন্তু বিপদ হল, পুরনো দায়িত্ববোধের আদর্শটি আঁকড়ে থাকলে আমরা এই সামূহিক ক্ষয়ক্ষতির দায়দায়িত্ব (responsibility) নিরূপণ করতে পারব না। কারণ, পুরনো দায়িত্ববোধের আদর্শ আমাদের শিখিয়েছে যে, রামের ক্ষতির জন্যে শ্যাম দায়ী, বড়জোর

শ্যামের পিতামহ দায়ী। সিডনি শহরের একজন ডিক বা বিলের প্রাণহানির জন্যে সে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষের অভ্যাস—যথা, নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলার অভ্যাস, মনের সুখে পেট্রোল পোড়ানোর অভ্যাস, নিচুমানের জ্বালানি ব্যবহারের অভ্যাস ইত্যাদি—দায়ী হতে পারে, সেই চিন্তা এ দায়িত্ববোধের অঙ্গ নয়। বস্তুত, গতানুগতিক নীতিবোধ এরকম ক্ষেত্রে দোষ দেওয়ার মত কাউকেই খুঁজে পাবে না। কেননা, যারা একশো বছর গাছ কেটেছে, পেট্রোল পুড়িয়েছে, আবহাওয়ার সর্বনাশ ঘটিয়েছে, তারা তো কেউ ডিক বা বিলের প্রাণহানির উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ করেনি। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম যে, বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথচ কাউকেই এর জন্যে দায়ী করা যাচ্ছে না। পুরনো নীতিবোধ বা দায়িত্ববোধ আঁকড়ে ধরে থাকলে এইরকম বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমান কালের পরিবেশ-নীতিবিদ্যা তাই এসব ক্ষেত্রে চিরাচরিত নীতিবোধ পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়। তিন ধরনের পরিবর্তনের কথা বলা হয়ে থাকে। তিনটিই আমাদের সাধারণ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে। অর্থাৎ যেরকম দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কাজকর্মের নৈতিক বিচার করতে অভ্যস্ত সেই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে। পরিবেশ-নীতিবিদ্যার প্রথম পরামর্শ হল, নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের আরও *সমগ্রবাদী* (holistic) হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিচারে সীমাবদ্ধ না থেকে দূরবর্তী দেশকালের বিবেচনাতেও পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে। অন্যভাবে বলা যায় : বিশ্বব্যাপী এক দায়িত্বশীল মহাসঙ্ঘের অংশ হিসেবে নিজেকে ভাবার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় পরামর্শ হল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয়ে আরও *সচেতনতার* (mindfulness) পরিচয় দিতে হবে। কেননা, এরকম সচেতনতা না থাকার দরুনই আমরা আমাদের অনেক দীর্ঘলালিত অভ্যাসকে বিশ্বপরিবেশের প্রতি অপরাধ বলে ভাবতে পারি না। তৃতীয় পরামর্শ হল, নিজের ভূমিকা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে *হিসেব কষার* (calculating) অভ্যাসটি পরিত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, আমি খুব সামান্যই পরিবেশের ক্ষতি করছি, কিন্তু অন্যেরা অনেক বেশি করছে, সুতরাং দায়দায়িত্ব তাদের, আমার নয়—এই ধরনের মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। পরিবেশ-নীতিবিদেরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, এই জাতীয় অঙ্ক কষার সূত্রেই আমরা নিজেদের ক্ষেত্রে পেট্রোল পোড়ানোর অভ্যাসটিকে প্রশ্রয় দিই, কিন্তু অন্যের বেলায় সাইকেল চালানোর উপদেশ দিই। এখানে উল্লেখ্য, পরিবেশ-আন্দোলনের কিছু কিছু নেতাও এরকম দ্বিচারিতায় ভুগে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, ডেভিড ব্রাউয়ার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ-আন্দোলনের এক নেতার দখলে আছে দুটি গাড়ি, চারটি রঙিন টি-ভি, দু'টি ভিডিও ক্যামেরা, তিনটি ভিডিও রেকর্ডার এবং এক ডজন টেপ-রেকর্ডার। ব্রাউয়ার অবশ্য অজুহাত দেখান এই বলে যে, পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তাঁর নিরলস প্রয়াসের অঙ্গ হল এসব অতি আধুনিক প্রযুক্তি।

পরিবেশ-নীতিবিদ্যার মত *ব্যবসা-নীতিশাস্ত্রও* (business ethics) অ্যাপ্লায়েড এথিকসের একটি সর্বাধুনিক শাখা। ফলিত নীতিবিদ্যার এই এলাকায় কী ধরনের বিতর্ক ওঠে তার একটা দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যসংস্থা জেনারেল মোটরস-এর নাম দুনিয়া জোড়া। বিশ্বের প্রথম সারির ধনী প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম এই কোম্পানিটি বহু দশক ধরে মোটরশিল্পে প্রভুত্ব করে আসছে। এহেন জেনারেল মোটরস ১৯৮০ সাল নাগাদ একবার আর্থিক লোকসানের মুখে পড়েছিল। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে বসে কর্মকর্তারা টের পেলেন, বিদেশী কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জেনারেল মোটরস এঁটে উঠতে পারছে না। ওঁরা আরও বুঝলেন, জেনারেল মোটরসকে প্রতিযোগিতায় ফিরিয়ে আনতে হলে কোম্পানির প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোতে বড়মাপের রদবদল ঘটাতে হবে। কেননা, বাজারের চাহিদা হল ছোটো মডেলের গাড়ি, যাতে জ্বালানির সাশ্রয় হয়। কিন্তু জেনারেল মোটরস-এর পুরনো কারখানাগুলোতে এ-জাতীয় গাড়ি তৈরির পরিকাঠামো নেই। কোম্পানির প্রযুক্তি-কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর জন্যে কর্মকর্তারা চার হাজার কোটি ডলারের একটা প্রকল্পও হাতে নিলেন। আর, সেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঘটাতে গিয়েই একটা নৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে গেল।

জেনারেল মোটরসের দুটি পুরনো কারখানা বন্ধ করে দেওয়া নিয়েই বিতর্কের শুরু। নতুন প্রকল্পকে রূপ দিতে গেলে জেনারেল মোটরসের বেশ কয়েকটি পুরনো কারখানা তুলে দেওয়া অনিবার্য ছিল। এদের মধ্যে দু'টি কারখানার অবস্থান ছিল ডেট্রয়েটে। এ দু'টি কারখানায় সেই সময় ৫০০ মানুষ কাজ করতেন। কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে এঁদের বেকার হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তার ওপর, খোদ ডেট্রয়েটের আর্থিক পরিস্থিতিও তখন বেশ সঙ্গীন। ১৮ শতাংশ লোক বেকার। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এই হার ৩০ শতাংশ। বছরের পর বছর ঘাটতি বাজেট। ফলে, সরকারি ঋণের গতিও ঊর্দ্ধমুখী। সব মিলিয়ে বেশ বেহাল অবস্থা। এর ওপর এলাকার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

প্রশ্ন হল ঃ এমতাবস্থায় ডেট্রয়েটের প্রতি জেনারেল মোটরস-এর কোনো নৈতিক দায়িত্ব থাকছে কিনা? কর্মকর্তারা বিষয়টা নিয়ে ভেবেছিলেনও। ওঁদের নজরে পড়েছিল যে, প্রস্তাবিত নতুন কারখানাগুলোর মধ্যে অন্তত একটা কারখানা যদি ডেট্রয়েটে গড়া যায় তাহলে সংস্থার বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেও ডেট্রয়েটের কল্যাণে আসা যেতে পারে। এখন, এইরকম একটি কারখানার জন্যে জেনারেল মোটরসের দরকার ছিল ৫০০ একর জমি, কাছাকাছি রেলপথ-সড়কপথের সুবিধা, এবং আরও নানা আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো। শুধু তাই নয়, সামনের দু'বছরের মধ্যে যাতে নতুন কারখানা চালু করে দেওয়া যায় সেই বাণিজ্যিক চাপটাও তখন প্রতিষ্ঠানের ওপর ছিল। দেখা গেল, স্থানীয়

একটিমাত্র এলাকা জেনারেল মোটরসের এসব দাবী পূরণ করতে সক্ষম। সেটি ডেট্রয়েট সংলগ্ন পোলটাউনের একটি ভূখণ্ড। কিন্তু সমস্যা হল, এ ভূখণ্ডে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের বসবাস। তাদের অধিকাংশই আবার কৃষ্ণাঙ্গ। মোটরসের কর্মকর্তারা হিসেব করে দেখলেন, রাজনৈতিক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে এ জমির দখল যদি পাওয়া যায়ও, তা এটিকে কারখানা গড়ার উপযোগী করে তুলতে তাঁদের প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলারের মত বাড়তি খরচ হবে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলেরই অন্য একটি রাজ্যে তাঁরা ৬৫ থেকে ৮০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে পরিকাঠামোর সবরকম সুবিধাসমেত কাঙ্ক্ষিত জমি পেয়ে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন হল ঃ এরকম পরিস্থিতিতে জেনারেল মোটরস কী সিদ্ধান্ত নেবে? ডেট্রয়েটের স্থানীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের অন্য রাজ্যটিতে গিয়ে কারখানা বানাবে? না কি, নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পোলটাউনের ওই বিতর্কিত ভূখণ্ডটিতে কারখানা তৈরির সিদ্ধান্ত নেবে? লক্ষণীয়, জেনারেল মোটরস যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত থাকছে নানা জনের নানারকম স্বার্থ। একদিকে আছে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, ক্রেতা সংস্থা, যোগানদার সংস্থা, এদের স্বার্থ। উদাহরণস্বরূপ, শেয়ারহোল্ডারেরা নিশ্চয়ই চাইবে না যে, ডেট্রয়েটে কারখানা বানাতে গিয়ে কোম্পানি ২০০ মিলিয়ন ডলার বাড়তি খরচের ঝুঁকি নিক। যেহেতু জেনারেল মোটরসের মত বাণিজ্যসংস্থার প্রাথমিক দায়িত্ব শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি, তাই এদের স্বার্থ দেখতে কোম্পানি দায়বদ্ধ। কিন্তু এদের স্বার্থ দেখতে গেলে মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের অন্য রাজ্যটিতে গিয়ে কারখানা গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেক্ষেত্রে ডেট্রয়েটের জনসাধারণ, বিশেষ করে সেখানকার পুরনো কারখানার কর্মীদের স্বার্থে আঘাত পড়তে বাধ্য। আবার, ডেট্রয়েটের স্থানীয় স্বার্থের খাতিরে যদি পোলটাউনে কারখানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে পোলটাউনের সাড়ে তিন হাজার অধিবাসীর উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সেক্ষেত্রে তাদের স্বার্থেও আঘাত পড়ছে না কি? অন্যভাবে বলতে গেলে, বিদেশী সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থ, ডেট্রয়েট অঞ্চলে থেকে যাওয়ার বাড়তি খরচ, মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের অন্য রাজ্যে চলে গেলে ডেট্রয়েটের জনজীবনে তার প্রভাব, পোলটাউন এলাকায় কারখানা বানালে সেখানকার আদি বাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ—এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিষয় বিচার করে তবেই এক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্তের দিকে এগোনো সম্ভব। প্রশ্ন হল ঃ জেনারেল মোটরস এক্ষেত্রে কী সিদ্ধান্ত নেবে এবং কেন নেবে?

পাশ্চাত্যের ব্যবসা-নীতিশাস্ত্রে (business ethics) এই সমস্যাটি স্টেকহোল্ডার সমস্যা (stakeholder problem) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'স্টেকহোল্ডার' কথাটা বানানো হয়েছে ইংরেজি 'স্টকহোল্ডার' (stockholder) শব্দটার আদলে। স্টকহোল্ডার

বলতে সাধারণত বড় বড় বাণিজ্যসংস্থার শেয়ারকে তাদের বোঝায়। অর্থাৎ যাদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানি তার মূলধন সংগ্রহ করে তারাই কোম্পানির স্টকহোল্ডার বলে গণ্য হয়। একটা সময় পর্যন্ত ভাবা হত যে, কোম্পানির সাধারণ শেয়ার (equity share) যাদের হাতে থাকবে একমাত্র তারাই—বাণিজ্যশাস্ত্রের পরিভাষায়, স্টকহোল্ডারেরাই—কোম্পানির যাবতীয় সিদ্ধান্তের নিয়ামক হবে। অর্থাৎ, তাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি নীতিগত সবরকম সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ব্যবসা-নীতিশাস্ত্রের সাম্প্রতিক বিতর্কগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে, স্টকহোল্ডারেরা ছাড়াও কর্মী, ক্রেতাসাধারণ, যোগানদার, সরকারী প্রশাসন, স্থানীয় জনসাধারণ এদের প্রতিও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় : কোম্পানির কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এদের লাভক্ষতির ব্যাপারটাও অবশ্য বিবেচ্য। অর্থাৎ, কোম্পানির সিদ্ধান্তগ্রহণের সঙ্গে যাদের যাদের ঝুঁকি বা স্টেক (stake) কোনোভাবে জড়িয়ে আছে তাদের সকলের প্রতিই কোম্পানি নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ। আজকের ব্যবসা-নীতিশাস্ত্রের পরিভাষায়, এরাই হল কোম্পানির স্টেকহোল্ডার (stakeholder)। জেনারেল মোটরসের দৃষ্টান্তটি বুঝিয়ে দিচ্ছে, স্টেকহোল্ডারদের সকলের স্বার্থ রক্ষা করা পরিস্থিতিবিশেষে কত কঠিন হতে পারে।